ভূমিকা

.... নতুন রূপে লাটাগুড়ি? লাটাগুড়ি বেশ কিছু দিন ধরেই এক জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত সমগ্র ভারতবর্ষে। কিন্তু লাটাগুড়ি প্রতিবারই যেন নতুন, কারণ লাটাগুড়ির বৈচিত্র গতিশীল। এখানে বৈচিত্রময় বন্য প্রানের বনরোমাঞ্চকর অনুভূতি ভ্রমণের স্মৃতি হয়ে থাকার পাশাপাশি পাহাড়ি আনন্দও উপভোগ করা যায়। সুদৃশ্য পুরোনো স্থানগুলোর সাথে এখন আরও নতুন নতুন অজানা অদেখা অনেক কিছু যা পুরোনোকেও হার মানায়।

চেনা পথে অচেনা জীবন যাত্রার ছবি হৃদয়ে বন্ধি হয় যেমন দুই বাংলা যেখানে এক হয় সেই তিন বিঘা করিডর, ডুয়ার্সের নদীদের রাণী ডায়না নদীর পাড়ের লালঝামেলা, ড্রাগন রাজার দেশের সামচি শহর।

লাটাগুড়ির চারপাশে ইতিহাস আজও থমকে আছে তার নিজের রূপে যেভাবে, মেটেলীর পাশে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি বিজড়িত এয়ারফিল্ড গ্রাউন্ড, শৈবতির্থ জল্পেশ ও জটিলেশ্বর, ঐতিহ্যময় ভ্রামরীদেবী মন্দির, শক্তিশ্বর বালাজী মন্দির, লেপ্চা রাজার ডালিম ফোর্ট।

আর নতুন রূপের লাটাগুড়ির মাঝেই লুকিয়ে আছে সাধ্যের মধ্যে নতুন স্বাদ, চা বাগানের অলিন্দে নতুন চা তৈরীর সাক্ষী থাকা, তিস্তার রূপালী বোরোলি মাছের স্বাদ গ্রহণ আর হাঁড়িয়ায় মনমাতিয়ে সবশেষে বৈচিত্র যেখানে থেমে থাকেনা সেই লাটাগুড়ির।

পেল্লাই চমচমে মুখ হবে মিষ্টি,
ছুটি পেলেই শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি,
নতুন রূপের লাটাগুড়িতেই,
সারা বছর সবার থাক দৃষ্টি।

চেনা পথ অচেনা জীবনযাত্রা

“বোলরে বোল, হেই সা
আউর থোড়া, হেই সা
কাঁধ লাগাও, হেই সা
জোরসে বোল, হেই সা।”

এক সময়ে এই সুরেলা স্লোগানেই ঘুম ভাঙতো সমগ্র লাটাগুড়ির। না এ কোন রাজনৈতিক মিছিলের স্লোগান ছিলোনা, বড়ো বড়ো লাঠা (কাঠের গুড়ি) লড়িতে তোলার শক্তি জোগানোর সমবেত স্লোগান। সেই সব সুরেলা আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে গেলেও লাটাগুড়ি কিন্তু তার নিজস্বতা হারায়নি। লাঠা অর্থাৎ কাঠের গুঁড়ি। এখান থেকেই হয়তো বা নামের উৎপত্তি, অনেকেরই ধারনা অপভ্রংশ হয়ে যা এখন লাটাগুড়ি হয়েছে। কারণ একসময় কাঠই ছিল লাটাগুড়ির মানুষের অর্থ উপার্জনের একমাত্র উৎস। সে সময়ে লাটাগুড়ির আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকতো কাঠের গুঁড়ি স–মিলে চেরাই হবার অপেক্ষায়। এখনো পর্যন্ত তিনটি স–মিল রয়েছে যা পূর্বের অতীত স্মৃতি রোমন্থন করে চলেছে। এমনিতেই লাটাগুড়িতে প্রকৃতি যেন তার সমস্ত সবুজ উজাড় করে দিয়েছে। তার উপরে গরুমারার বন্য প্রাণের সংমিশ্রণ বাড়িয়ে দিয়েছে লাটাগুড়ির রোমাঞ্চ। লাটাগুড়ির পূর্ব ও উত্তর দিকে বিস্তীর্ণ গভীর বনাঞ্চল, উত্তর পশ্চিম দিকেও তা বেষ্টিত। আর এই জঙ্গলের বুক চিরে চলে গেছে একত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক। যার ডান দিকটা গরুমারা জাতীয় উদ্যান আর বাম দিকটা লাটাগুড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। পশ্চিম দিকে বয়ে চলেছে নেওড়া নদী তার নিজস্ব গতিতে। এ নদীর উৎপত্তি পাহাড় থেকে হওয়াতে শীতকালে এই নদীতে জল প্রায় থাকেই না বলা যায়। কিন্তু কুয়াশাচ্ছন্ন শীতে এ নদীর রূপ অপরূপ, বেলা বাড়তেই চারিদিক কুয়াশা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে নেওড়া নদীর ওপর দিয়ে যখন কাঞ্চনজঙ্ঘার দুধসাদা বরফ চূড়া নেওড়া চা বাগানের ছায়া গাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে লাটাগুড়ির বুকে উকি দেয় তখন পাহাড়ে না গিয়েও লাটাগুড়ি থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার স্বাদ উপলব্ধ করা যায়। বর্ষায় নেওড়া নদী আরো মোহময়ী হয়ে ওঠে, তার দু–কূল ছাপানো জলোচ্ছ্বাসে, নদীর দুই পারের বিস্তির্ণ সবুজ শস্য ক্ষেত সেই অপরূপ রূপে বাড়তি অলংকার হয়ে ওঠে। যার ফলেই শীত ও বর্ষা উভয় মরসুমে লাটাগুড়িকে ভিন্ন রূপে দেখার সুযোগ পাওয়া যায়।

গরুমারা জাতীয় উদ্যানের প্রবেশ পত্র শুধুমাত্র লাটাগুড়িতে থাকা টিকিট কাউন্টার থেকে সংগ্রহ করতে হয় বলেই আপনাদের লাটাগুড়িতে রাত্রি যাপন করাটাই সমীচিন। এছাড়াও একমাত্র লাটাগুড়ির সংরক্ষিত জঙ্গলে সাফারি করার প্রয়োজনীয় টিকিট সংগ্রহ করার কাউন্টার। লাটাগুড়ির আনাচে কানাচে দেখতে হলে অবশ্যই একদিন টোটো রিক্সায় উঠে পড়ুন আর দেখে নিন নেওড়া রেল ব্রীজ, নেওড়া চা বাগান, স্বরসতী বন বস্তি, মহামায়া কালীবাড়ি, বন বিভাগের কালী ও হরি মন্দির, জমিদারের ভগ্নপ্রায় পুরোনো বাড়ি, লাটাগুড়ির হাট (শনি ও বুধবার), আর এসব দেখতে দেখতে টোটো চালকের টোটো চালকের মুখে জেনে নিন লাটাগুড়ির পুরোনো ইতিহাস যা আপনাদের লাটাগুড়ি ভ্রমনের চির স্মৃতি হয়ে থাকবে, ভ্রমণ শেষে বাড়ি ফিরে এলেও মন পড়ে থাকবে লাটাগুড়িতেই, আর এ সব কিছুর জন্যেই লাটাগুড়ি একবার নয়, সবার জন্যেই বারবার।

বন্যপ্রাণের বনরোমাঞ্চ

গরুমারার ইতিবৃত্ত

হিমালয়ের পাদদেশে মোহময়ী ডুয়ার্স এর পশ্চিম দিকে প্রায় ৮০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে অবস্থিত গরুমারা জাতীয় উদ্যানে মূলত তৃণভুমি ও আর্দ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের সমাহার দেখা যায়। ১৮৭৫ সাল থেকেই গরুমারা একটি সংরক্ষিত অরণ্যভুমি। ১৯৭৬ সালে একে অভয়ারণ্য ঘোষনা করা হয়। ১৯৯৪ সালেন ৩১শে জানুয়ারী একে ভারতের জাতীয় উদ্যানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। শুরুতে গরুমারার আয়তন ছিল মাত্র ৭৮ কিলোমিটার। এরপর চারপাশে এর বিস্তৃতি ঘটিয়ে একে ৮০ বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত স্থান দেওয়া হয়। স্বাধীনতার আগে ১৯৪২ সালে গরুমারাকে সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সে সময়ে লাটাগুড়িতে বাঘের ডাক শোনা যেত। একদিন হাট থেকে ফেরার পথে রাত হয়ে যেতে জঙ্গলের মধ্যেই রাতের ডেরা বাঁধে হাটুরেরা। আগুন–পাহারা সবই ছিল। তবুও তার মধ্যে গরুর গাড়ির বলদ উঠিয়ে নিয়ে গেল বাঘ। সেই থেকে জঙ্গলের নাম হয়ে গেল গরুমারা। ২০০৯ সালে ভারতের পরিবেশ ও অরণ্য মন্ত্রক এই উদ্যানকে ভারতের ২৩৪টি জাতীয় উদ্যানের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দেয়। গরুমারা জাতীয় উদ্যানে রয়েছে মোট ৪টি নজরমিনার। লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে ৪টি নজরমিনারে প্রবেশের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করা যায়। চারটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই অনুমোদন দেওয়া হয়। বন্যপ্রাণ উপভোগ করার পাশাপাশি এখানকার স্থানীয় আদিবাসীদের নৃত্যও গরুমারাপ্রেমীদের মন জয় করে।

যাত্রাপ্রসাদ নজরমিনার

এই নজরমিনারটি গরুমারা বীটে অবস্থিত। এখারে মূলত দুটি নজরমিনার রয়েছে। একটি যাত্রাপ্রসাদ ও অপরটি রাইনো পয়েন্ট। যাত্রাপ্রসাদ নামক কুনকি হাতির নাম অনুসারে এই নজরমিনারটির নামকরণ হয়। অসম থেকে আনা বিখ্যাত দাঁতাল যাত্রাপ্রসাদ তার দীর্ঘ ছাব্বিশ বছরের কর্মজীবনে (১৯৭১ – ১৯৯৭) বন দপ্তরে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেছিল।

মেদলা নজরমিনার

গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ওপর একটি জনপ্রিয় নজরমিনার হলো মেদলা নজরমিনার। জিপসি গাড়িতে চড়ে জংলী পথ ধরে শুরু হয় মেদলা যাত্রা।

অরণ্যের নিস্তব্ধতা উপভোগ করতে করতে চলে যাওয়া যায় রামসাইতে। এখান থেকে সাফারির জিপসি ছেড়ে উঠে পড়তে হয় মহিষের গাড়িতে। মহিষের গাড়িতে চড়ে কাঁচা বন্য পথ ধরে সোজা মেদলা। মহিষের গাড়ির দুলকিচালের আমেজ আর বন্য পরিবেশের রোমাঞ্চকতার মাঝে আপনি যেন সত্যিই আজ সবুজ দ্বীপের রাজা। নজরমিনারে যাবার ফাঁকে আপনি কালিপুর ইকো ভিলেজে নৌকা বিহারের আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন। অথবা কিছুটা সময় কাটাতে পারেন রঙবেরঙের প্রজাপতিদের সাথে, মেদলার প্রজাপতি পার্কে। এরপর চলে আসুন কালিপুর ইকো ভিলেজ অথবা বুধুরাম বন বস্তিতে। সেখানেই প্রদর্শীত হয় আদিবাসী নৃত্য। এই নজরমিনার পর্যটকেদের জন্য সারা বছরই খোলা থাকে।

চন্দ্রচূড় নজরমিনার ও চুকচুকি নজরমিনার

এছাড়াও গরুমারাতে রয়েছে চন্দ্রচূড় নজরমিনার ও চুকচুকি নজরমিনার। অন্য নজরমিনারগুলির মতো এগুলোতেও বন্যপ্রাণের আধিক্য ও বৈচিত্র চোখে পড়ার মতো। চুকচুকি নজরমিনার পাখিপ্রেমীদের কাছে ভীষণভাবে জনপ্রিয়।

চাপড়ামারি অভয়ারণ্য

গরুমারার পাশাপাশি বন ও বন্যপ্রাণের টানে ঘুরে আসতে পারেন চাপড়ামারি অভয়ারণ্য, যদিও ১৯৪০–৪১ সাল থেকেই প্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে ঘোষিত, তবুও অভয়ারণ্যের স্বীকৃতি জোটে ১৯৭৬–এ। বনভূমির আয়তন ৯.৬ বর্গ কিলোমিটার। সেখানে রয়েছে চাপড়ামারি নজর মিনার। সেখান থেকে চার কিলোমিটার জংলি পথ ধরে এগিয়ে গেলে পৌঁছে যাবেন পানঝোরায়। যেখানকার নেপালিদের উপজাতিয় সান্ধ্যনৃত্য মুগ্ধ করে তুলতে পারে আপনার নয়ন ও হৃদয়কে।

জঙ্গল সাফারী

প্রকৃতি ভালবাসেনা এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। সবুজ ঘন বন জঙ্গল, বন্য প্রাণী, নাম না জানা বিরল প্রজাতির পাখিদের কিচির মিচির, বন্য পাহাড়ি নদীর উচ্ছাস, সব মিলিয়ে প্রকৃতি যেন মানুষকে জড়িয়ে রেখেছে এক অদ্ভুত মোহমমতার টানে। আর সেই টানেই প্রতিবছর প্রকৃতির কাছে ছুটে আসে দেশ বিদেশের পর্যটকেরা। পশ্চিমবঙ্গে নির্মল প্রকৃতির অন্যতম ঠিকানা লাটাগুড়ির সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এই বনাঞ্চলের মোহময়ী সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করবার অন্যতম উপায় হল জঙ্গল সাফারি। এক্ষেত্রে বনভূমির বাফার অঞ্চলগুলিতে জিপসিতে করে পর্যটকরা প্ররিভ্রমণ করতে পারেন এবং অরণ্যের নির্জনতা ও বন্যপ্রাণীদের দর্শন উপভোগের সুযোগ পান। প্রতিদিন ২টি শিফ্‌ট হয়। ভোর ৫টা ৩০ থেকে ৭টা ৩০পর্যন্ত এবং ৩ টা ৪৫ থেকে ৬টা পর্যন্ত। বুধবার জঙ্গল সাফারী বন্ধ থাকে।

বিশ্ববাসীর ঘুম যেখানে পাখির ডাকে ভাঙে

ভোর তখন সাড়ে চারটা, চাপড়ামারি জঙ্গলের উপর দিয়ে সবে দিনের আলো আগুন রাঙা রঙে প্রস্ফুটিত হতে সুরু করেছে। চাপরামারী জঙ্গলের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে কর্কশ গলায় প্রথম ডেকে উঠলো ভারতের জাতীয় পাখি ময়ূর। অমনি ভারত বিখ্যাত রেডিও সঞ্চালক সুনিত টেন্ডনের গলায় ভেসে আসলো হ্যালো ইন্ডিয়া! এর পর একে একে বন মোরগ, দোয়েল, মদনটাক, মাছরাঙ্গা, শ্যামা আরো কত কি পাখিদের কূজন। আর এই সব পাখিদের সমবেত ঐকতান ছড়িয়ে পড়লো ভারত সহ বিশ্বের একুশটি দেশে। মে মাসের প্রথম রবিবার ডন কোরাস ডে তে ভারতের আকাশবাণী ও আয়ারল্যান্ড এর ডাবলিন বেতার কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে চাপরামারী অভয়ারণ্য থেকে প্রায় টানা চার ঘন্টা ধরে সরাসরি সম্প্রচার হলো। আসলে চাপড়ামারী অভয়ারণ্য এর বন্য প্রাণীর বৈচিত্রতা ও এখানকার মায়াবী পরিবেশ সবসময়ই মুগ্ধ করে পর্যটকদের। হাতি বাইসন হরিণের পাশাপাশি বৈচিত্রময় পাখিদের সহাবস্থান এই জঙ্গলে সব সময়েই লক্ষ্য করা যায়। খুব সহজেই দেখা পাওয়া যায় বা ডাক শোনা যায় রাপটর্স, কর্মরেন্ট, ইগ্রেটস, হেরণস, আইবিশ, স্পনবিল্স, স্ট্রক, মোরহেন্স, ফওল্স, ফ্লাইক্যাচার, বী–ইটার, কিংফিশার, বারবেটস, সুইফটস, হুপই, হর্ণবিল, ডাব, পিজেওন, পারাকীট, স্পর্রোও, ফিঞ্চেস, করভিডিআই, উডপেকার, ডাক, ওয়াডর বার্ডস, কুককু, আউল, ব্যবলার, লার্ক, ড্রোংগো, মিনিভেট, স্রাইক, লিফ বার্ড, ওয়াকটেইল, সোওয়ালো, থ্রাস, ওয়ার্বলার, রবিন, বুলবুল, পিপটিস, সান বার্ডস এই সমস্ত বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদের। চাপড়ামারী ওয়াচ টাওয়ারের সামনে বিশাল জলাশয় এই অঞ্চলের পশু পাখিদের তেষ্টা মেটাবার বা জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকতে খাদ্য যোগানের এক উৎস স্থল। তাই এখানেই সারা বছরই এদের ঘোরাফেরা। আর সেইকারণেই এশিয়া মহাদেশের মধ্যে ভারতের চাপড়ামারী অভয়ারণ্যকেই এবছর বেছে নেওয়া হলো বিশ্ব কলতান দিবস উদযাপন করার স্থান হিসেবে। আর সেই সঙ্গে বিশ্ববাসীর মননে সংযুক্ত হলো চাপড়ামারী অভয়ারণ্যের নাম। সে নাম পাখিদের ঐকতানের, যেখানে বিশ্ববাসীর ঘুম পাখির ডাকে ভাঙে।

WATCH TOWER & JUNGLE SAFARI DETAILS

WATCH TOWER NAMES	Entry Permit Per Head				Safari Vehicle Fare Max.6 P	Guide Charge Per Car	Car Entry Fee Per Car	Video Camera Charge
	1st Shift	2nd Shift	3rd Shift	4th Shift				
Jatraprosad Watch Tower	120/-	120/-	120/-	160/-	980/-	180/-	100/-	200/-
Medla Watch Tower	120/-	120/-	120/-	120/-	980/-	180/-	100/-	200/-
Chapramari Watch Tower	70/-	70/-	70/-	120/-	1080/-	180/-	100/-	200/-
Chandrachur Watch Tower	70/-	70/-	70/-	120/-	930/-	180/-	100/-	200/-
Chukchuki Watch Tower	70/-	70/-	70/-	120/-	690/-	180/-	100/-	200/-
Jungle Safari	25/-			25/-	1140/-	180/-	50/-	200/-

TIMINGS OF VISIT

	Ticket Issue Time	Safari Timings
MAR. to SEP. Except Forest Closure Days		
1st Shift	05:30 hrs.	06:00 to 07:30 hrs.
2nd Shift	06:30 hrs.	08:30 to 10:00 hrs.
3rd Shift	13:00 hrs.	14:00 to 15:30 hrs.
4th Shift	14:00 hrs.	16:30 to 18:00 hrs.
OCT. TO FEB.		
1st Shift	06:00 hrs.	06:30 to 08:00 hrs.
2nd Shift	07:00 hrs.	09:00 to 10:30 hrs.
3rd Shift	12:00 hrs.	13:00 to 14:30 hrs.
4th Shift	13:00 hrs.	15:30 to 17:00 hrs.

*** Bull Cart Fare 40/- extra for Medla Tower * Safari Vehicle Fare 210/- extra for Chapramari WT on 4th Shift**
Rates & Timings may change without any notice. Forest Safari Closed on Wednesday, Watch Towers Closed on Thursday.

প্রকৃতি ও লাটাগুড়ি

ডুয়ার্স থেকে ডোকালাম

অবাক হচ্ছেন, ডুয়ার্স থেকে চীনের ডোকালাম? হ্যাঁ বাস্তবেও এটা সম্ভব, আর সেটা ভিসা পাসপোর্ট ছাড়াই, তাও আবার লাটাগুড়ি থেকে গাড়িতে মাত্র এক ঘন্টার কিছু বেশি সময়ে। চাপড়ামারী জঙ্গল পেরিয়ে সোজা ঝালং বিন্দুর রাস্তায় রাবার গাছের বাগান দেখতে দেখতে ডান হাতের বাঁকটা পেরিয়েই কালিম্পং জেলার গৈরীবাস। সেখান থেকে বাঁ দিকের পাহাড়ি পথটি ঘুরপাক খেতে খেতে সোজা উপর দিকে চলে গেছে দলগাঁওতে। এই রাস্তাটি শেষ হচ্ছে দলগাঁও ভিউ পয়েন্টে গিয়ে। পাহাড়ের চূড়ার শেষ প্রান্তে বিস্তীর্ণ সমতল এলাকা নিয়ে এই ভিউ পয়েন্ট। এখানে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামতেই চারিদিকের মনোরম দৃশ্য দেখে মনে হবে এ যেন এক নতুন ঠিকানায় মন ভাল করার দেশে এসে পৌঁছলাম। গোটা এলাকা জুড়ে ঠান্ডা হাওয়া শরীরের উষ্ণতার সঙ্গে মিশে গিয়ে মনকে আরো উত্তাল করে তুলবে পাহাড়ে ঘেরা এই এলাকা সম্বন্ধে জেনে নিতে। ডান দিকের সবচেয়ে নিচু পাহাড়ের গায়ে গাড়ী চলাচলের যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে সেটা ভূটানের ফারা গ্রাম, ঠিক তার নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে ভারতের জলঢাকা নদী। এই নদীই দু–দেশের সীমারেখা তৈরী করে দিয়েছে। ছবির মতো সুন্দর নদীর এপারটি ভারতের ঝালং, ঠিক তার ডান দিকের কিছুটা সমতল ফাঁকা ভূমি সেটা হলো ভারত ও ভূটান দেশের একমাত্র নো–ম্যান্স ল্যান্ড যা শুধুমাত্র দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট থেকেই ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। আর বা দিকের প্রথম সারির পাহাড়ের উপর দিয়ে যে আরেকটি পাহাড় উকি দিচ্ছে সেটা সিকিমের পাহাড়, ঠিক তার পেছনের পাহাড়টিতে ভাল করে চোখ রাখলে দেখা যাবে সেই পাহাড়ের গায়ে অনেকটা এলাকা জুড়ে একটি সাদা সরল রেখা। স্থানীয় বাসিন্দাদের মত অনুযায়ী ওটা নিয়েই সাম্প্রতিক কালে ভারত ও চীন দেশের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। আসলে পাহাড়ের গায়ের ঐ সরলরেখাটি সমগ্র দেশ জুড়ে বহু চর্চিত ডোকালাম, যদিও অনেকেই এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। আর ঐ ডোকালামের সামনে দিয়ে তৈরী হওয়া সেই রাস্তাটি যা নিয়ে চীন ও ভারতের সেনাবাহিনীর মাঝে বাকযুদ্ধ প্রায় হাতাহাতিতে পৌঁছে গিয়ে দু দেশের সু সম্পর্কের মাঝে কিছুটা যুদ্ধের বাতাবরণ তৈরী হয়েছিল। দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট থেকে ডোকালাম পাসের এই দৃশ্য দেখতে দেখতে শরীর ভারী হয়ে উঠবে, হিমেল হাওয়ার মাঝে সুদৃশ্য মিনারে দাঁড়িয়ে দেশের সীমারেখার কথা ভাবতেই হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠবে, তাদের কথা ভেবে যারা হিমশীতল বরফের মাঝে দাঁড়িয়ে দেশ রক্ষার শপথ পূরণে সদা ব্যাস্ত। আর ওরা দাঁড়িয়ে আছে বলেই আমরাও নিশ্চিন্তে আছি।

ব্রেকফাস্ট সারুন ভারতে লাঞ্চ করুন বিদেশে

দৈনন্দিন জীবনের ছকে বাঁধা গন্ডীর বাইরে গিয়ে একটু মনের শান্তি আর প্রাণের আরাম খুঁজে নিতে কে না চায়? তবে আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনে সাধ আর সাধ্যের অন্তর্বর্তী দ্বন্দ্বটা চিরকালই বড্ড তীব্র। তাই সাধ থাকলেও ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির বিদেশ

বিভুঁই হওয়ার পথে বাধ সাধে সাধ্য। তবে এবার সাধ্যের মধ্যেই হোক সাধ পূরণ। ডুয়ার্সের ঘন অরণ্যের চেনা পথ পেরিয়ে পৌঁছে যান ডুক রাজার দেশে। কোনো ভিসা পাসপোর্ট ছাড়াই। লাটাগুড়ি থেকে ব্রেকফাস্ট সেরে বেড়িয়ে পড়ুন। ঘন্টা দুয়েকের পথ অতিক্রম করে আপনি পৌঁছে যান ভারতের প্রান্তিক শহর জঁয়গাতে। জঁয়গাতেই ভারতের শেষ সীমানা। এরপর থেকে ভুটান শুরু। ভুটান পৌঁছে প্রথমেই দেখে নিন নোরগে কুমীর প্রজনন কেন্দ্র। আপনার সন্তানকে নিয়ে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করুন বিশ্বের সবথেকে বৃহত্তম

সরীসৃপ প্রাণীর জীবনশৈলী। ১৯৭৬ সালে তৈরী এই প্রজনন কেন্দ্রে বর্তমানে ২২টি কুমীর রয়েছে। মূলতঃ ঘড়িয়াল ও মকর এই দু প্রজাতির কুমীরই এখানে দেখতে পাওয়া যায়। জঁয়গা পেরিয়ে পরবর্তী গন্তব্য ফুন্সেলিং জিরো পয়েন্ট। পথ আটকে সুবিশাল ভারত ভুটান গেট। ভূটানী স্থাপত্য শৈলীর এক দৃষ্টিনন্দন উপহার। গেট পেরোলেই আপনি ভূটানে। শহরটির নাম ফুন্সেলিং। বিশ্বের দরবারে দেশটি ভূটান নামে পরিচিত হলেও ভূটানিদের কাছে তাদের দেশের নাম ডুক ইউল যার অর্থ বজ্র ড্রাগনের দেশ। ডুক বা বজ্র ড্রাগন ভূটানীদের জাতীয় প্রতীক। এটি আসলে ভূটানের পৌরানিক কাহিনীর অংশ। ভূটানের রাজাদের বলা হয় গিয়ালপো বা ড্রাগন রাজা। মাত্র ৮৮০০ বর্গ কিমি জুড়ে বিস্তৃত এই দেশ ছোট বড় পাহাড়ে ঘেরা। ছবির মতো সাজানো এই দেশের মাটিতে পা রেখেই বুক ভরে নিশ্বাস নিন। কারণ আপনি দাড়িয়ে বিশ্বের একমাত্র কার্বন নেগেটিভ দেশে অর্থাৎ এই দেশ যে পরিমান কার্বন–ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে তার থেকে বেশী পরিমান শোষণ করে। পরিবেশ ও জলবায়ুগত সাজ্যতার জন্য ভূটানকে অনেকে এশিয়ার সুইজারল্যান্ডও বলে থাকে। ভূটানের প্রন্তিক শহর ফুন্সেলিং অবস্থিত তোর্সা নদীর তীরে। ফুন্সেলিং শহরের কিছুটা বাইরে খারবন্দি পাহাড়ের ওপর রয়েছে বৌদ্ধ গুম্ফা। রঙিন গুম্ফার শান্ত পরিবেশ আপনার হৃদয়ে জাগাবে স্নিগ্ধতার আবেশ। পাহাড় থেকে তোর্সার সমতলে নেমে আসার দৃশ্য সত্যিই নয়নাভিরাম। সন্ধ্যের আগেই আপনার বিদেশ ভ্রমণ সেরে ফিরে আসুন আপনার নিজের দেশ লাটাগুড়িতে।

দুই বাংলা এক হয় যেখানে

লাটাগুড়ি থেকে গাড়ি চেপে ঘন্টা দুয়েক পথ অতিক্রম করে পৌঁছে যেতে পারেন তিনবিঘা করিডরে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলা ও বাংলাদেশের লালমনি হাটের পাটগ্রাম উপজেলার সীমান্তে অবস্থিত এই করিডর।

উভয়দেশ তাদের ছিটমহল যথাক্রমে দহগ্রাম আঙ্গরপোতা (বাংলাদেশ) ও দক্ষিণ বেরুবাড়ি (ভারত) –এর মধ্যে যাতায়াতের সুবিধার্থে এটি তৈরী করে। ভূমিটির মোট আয়তন তিন বিঘার সমান (১,৫০০–৬৭৭১ বর্গমিটার) বলে এটির নামকরণ হয়েছে তিনবিঘা করিডর। এই করিডরে দাঁড়িয়ে খুব কাছ থেকে উপভোগ করুন ওপার বাংলার হাতছানি। আপনার আকর্ষনের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠবে বি.এস.এফ ও বি.জি.বি –এর সান্ধ্যকালীন কুচকাওয়াজ। বিকেল ৪–৫ টা নাগাদ শুরু হয় এই কুচকাওয়াজ। বিউগিল বাজিয়ে পূর্ণমর্যাদায় উভয় দেশের জাতীয় পতাকা নামিয়ে আনা হয়। বিউগিলের মিলিত সুরের

আবেশ আপনাকে পৌঁছে দেবে কবি গুরুর ঐ রাঙামাটির পথে। যে পথ ভারতের নয়, যে পথ বাংলাদেশেরও নয়। এই পথ আপনার জন্মভূমির, এই পথ আমাদের বঙ্গভূমির।

ঝামেলা বিহীন লালঝামেলায়

লাটাগুড়ি থেকে গাড়িতে এক ঘন্টায় পৌঁছে যাবেন ঝামেলা বিহীন লালঝামেলায়। ঝামেলা কথাটায় অনেকের মন এলোমেলো হতে পারে, কিন্তু ভরসা রেখে নিশ্চিন্তে যান মন ভালো হয়ে যাবে। আসলে লাল সোমরা ও ঝামেলা সোমরা এই দুজনের নামেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘেরা এই জায়গার নাম হয়েছে লাল ঝামেলা। সেই দুজন ব্যক্তি এখন আর বেঁচে নেই। চা বাগানের শ্রমিকদের দাবী আদায়ের কঠিন সংগ্রামের আদিবাসি এই দুজনের জীবন কথা শুধুই এখন এক ইতিহাস। তবে আর যাই হোক এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনাদের মুগ্ধ করবেই। লাটাগুড়ি থেকে মূর্তি নদী পেরিয়ে সোজা জলঢাকা নদীর ওপর দিয়ে আরো কিছুটা এগিয়ে বা হাতে ক্যারণকে পিছে ফেলে রেড ব্যাংক চা বাগান থেকে বা হাতের সরু পিচের রাস্তাটি অপরূপ সুন্দর চা বাগানের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে লালঝামেলার শেষ প্রান্তে এসে শেষ হয়। এখানে প্রকৃতি যেন উজাড় করে দিয়েছে তার সৌন্দর্য। অনেকটা নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে ডুয়ার্সের নদীদের রাণী ডায়না। তার ঠিক ঐপারটি ভূটানের সামচি শহর যা দৃশ্যত অপরূপ। ওপর থেকে ধীরে ধীরে পায়ে হেঁটে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের দিকে নেমে এলে সোজা ট্রেকিং পথটি চলে আসবে নদীতে যা আপনাকে এক ভীষণ রোমাঞ্চকর অনুভূতির মাঝে এনে দাঁড় করাবে। ডায়না নদীর শ্বেতশুভ্র হিমশীতল জলে পায়ের পাতা ভিজতেই সে এক অন্য অনুভূতি হবে, এক ঝাঁক নদীয়ালি মাছ বার বার করে আপনার পায়ের পাতা স্পর্শ করে যেন বলতে চাইবে লাল ঝামেলায় আপনাকে স্বাগতম, আপনাদের স্বাগতম।

এক ছুটে ড্রাগন রাজার দেশে

লাটাগুড়ি থেকে এক ছুটে পৌঁছে যান ড্রাগন রাজার দেশে, মানে ভূটানে। এ অবাস্তব মনে হলেও আসলে বাস্তবেও সম্ভব। লাটাগুড়ি থেকে ঘন্টাখানেকের সফরে চা বাগানের সবুজ গালিচার বুক চিরে পৌঁছে যান সামচিতে। যাত্রাপথে ভারী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের পাশাপাশি নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষন করুন এখানকার সহজ সরল মানুষগুলোর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। ফেসবুক–হোয়াটসআপ–ওলা–কে.এফ.সি–র অত্যাধুনিক বিলাসীতা যাদের এখনো স্পর্শ করতে পারেনি। তাদের পরশে এক অদ্ভুত শান্তি ও স্নিগ্ধ আবেশের ছোঁয়া লাগবে আপনার মননে। সামচি পৌঁছনোর আগেই আপনাকে স্বাগত জানাবে সুবিশাল ভূটান গেট। বিদেশের মাটি স্পর্শ করার আগে দেশের মাটিতে কিছুক্ষণ দাড় করিয়ে রাখবে ওই সুবিশাল গেট।

দাঁড়াবারই কথা কারন সমগ্র গেট জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে কোন অজানা শিল্পীর অপরূপ কারুকার্যশৈলী। মুগ্ধতা যে বাঁধ মানে না। তবে সাবধান, ক্যামেরা যেন ঝল্‌সে না ওঠে, এই গেটের ছবি তোলা বারণ। গেট অতিক্রম করলেই আপনি ভূটানে। সচিত্র পরিচয় পত্র দেখিয়ে ভূটান পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দুটো পাহাড়ি পাক দন্ডী পেরিয়ে সামচি বাজারের পাশে পার্কিং এ গাড়ি রেখে শুরু করুন হাঁটা পথে ভূটান দর্শন। রাস্তার দুধারে ভূটানী জীবনশৈলী পর্যবেক্ষণ করতে করতে পৌঁছে যান বৌদ্ধ গুম্ফায়। স্থানীয় বাসিন্দারা সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা সারতে জপমালা হাতে ভিড় জমান এই গুম্ফায়। গুম্ফাকে প্রদক্ষিণ করতে করতে আওড়াতে থাকেন পবিত্র বৌদ্ধ মন্ত্র। অজানা ফুলের মাতোয়ারা গন্ধে আর পবিত্র বৌদ্ধ মন্ত্রের সুরের মাঝে হারিয়ে যান কিছুক্ষণের জন্য। খুঁজে পাবেন আপনার মাঝে এক অন্য 'আমি' কে। গুম্ফার বিপরীতে আছে শিবালয় (সুতীর্থেশ্বর মহাদেবী মন্দির)। একই পথের দুই ধারে দুই ভিন্ন ধর্মের ঐকান্তিক সমাবেশ এ যেন বৈচিত্রের মাঝে মৈত্রীর জয়গান আর তার সাক্ষী শুধু আপনি।
লাল মার্বেল মোড়া এই শৈব মন্দিরের প্রতিটি কোনায় শিল্প যেন কথা বলে। মন্দিরের সর্বাঙ্গ জুড়ে রয়েছে অসামান্য স্থাপত্যশৈলী ও সুক্ষ কারুকার্যের স্নেহস্পর্শ। বিশেষ করে মন্দিরের সেগুন কাঠের দরজার শৈল্পিক নক্‌শা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন এলাকার মনোরম পরিবেশে একান্তে কাটিয়ে নিন কিছুটা সময়। তারপর সন্ধে নামার আগেই ফিরে চলুন লাটাগুড়ির উদ্দেশ্যে।

লাটাগুড়ি থেকে মেঘের দেশে

কুয়াশা ও মেঘে ঢাকা পাইন গাছে ঘেরা এই ছোট্ট গ্রামটি রিশপ হলো হিমালয় দেখার ঝুল বারান্দা। লাটাগুড়ি থেকে প্রায় ঘন্টা তিনেকের এর পথ। ভূটানের সঙ্গে বাণিজ্যের পুরনো পথের ২৩৫০ মিটার উচ্চতায় থাকা লাভা হল মেঘ পরীর দেশ। পাহাড় জঙ্গলের নৈসর্গিক শোভা মনকে আবিষ্ট করে। লাভার নেপালি বস্তি পেরিয়ে দশ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে রচেলা পাহাড় যা ৩১৭০ মিটার উচ্চে ৮৮ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপ্ত ১৯৯২ এ গড়া ভার্জিন ফরেস্ট ন্যাওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক। প্রকৃতি উপভোগ ও পাখি দেখার জন্য বিখ্যাত লাভা, নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কে ওঠার সূচনাবিন্দুও। আছে বৌদ্ধদের একটি সুন্দর মোনাস্ট্রি ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। শহরের ব্যাস্তময় জীবন ও কোলাহল থেকে শত পথ দূরে পাইন, চির, ধুপির জঙ্গলের নিরিবিলি পথে ঘুরে বেড়ালেও মন তরতাজা হয়ে ওঠে।
লাভা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে ৮২৫০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত রিশপ্। রিশপ্ শব্দের অর্থ হল পাহাড়ের মাথায় একলা গাছে – লাভা থেকে পাহাড়ি পথে ট্রেকিং করে পৌঁছানো যায় রিশপে। অবশ্য লাভা থেকে রিশপ্ পর্যন্ত জিপ চলার পথও আছে। রিশপের রাস্তা এখনো কাঁচা। অপার সৌন্দর্যের আধার রিশপ্। আর কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন হাতের কাছে। নাথুলা পাস, তিন সীমানা, গ্যাংটক, তিব্বতের পাহাড়গুলি সহ এখান থেকে হিমালয়ের অসাধারণ দৃশ্য চোখে পড়ে।

মূর্তি

গরুমারা জাতীয় উদ্যানকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বেশ গ্রাম যার মধ্যে ছোট্ট একটি গ্রাম হল মূর্তি। আসলে পাহাড়ের কোল থেকে বয়ে আসা উদ্যম মূর্তি নদীর তীরে এই গ্রামটি অবস্থিত তাই নদীর নাম অনুযায়ী গ্রামের নাম মূর্তি। পাহাড়–জঙ্গল আর মূর্তি নদী নিয়ে অবকাশ যাপনের মনোরম ঠিকানা গ্রামটি। যেখানে রাত হলে শোনা যায় মূর্তি নদীর কল্ কল্ স্রোতের আওয়াজ আর শরীরে শিহরন জাগানো বন্য প্রাণীর আর্ত চিৎকার। মূর্তি নদীর বুকে গড়ে ওঠা মূর্তি ব্রিজকে ঘিরে তৈরী জনপ্রিয় পিকনিক স্পট। মূর্তি ব্রীজ পেরিয়ে খুনিয়া মোড়। রাস্তার দুপাশ জুড়ে ঘন জঙ্গল। চেকপোস্ট থেকে কিছুটা এগোলেই চন্দ্রচূড় ওয়াচটাওয়ার। ঘাসজমিতে হাতি ও বাইসনের দেখা মেলে।

ঝালং–বিন্দু–প্যারেন

লাটাগুড়ি থেকে খুনিয়া মোড় হয়ে ঘন অরণ্য বেষ্টিত পথ ধরে চলে যাওয়া যায় পাহাড়ের কোলে অবস্থিত একটি অপূর্ব গ্রামে। গ্রামের নামটিও ভারী সুন্দর ‘ঝালং’। দুই অশান্ত পাহাড়ি নদী – ঝালং খোলা আর রঙ্গু খোলা নিয়েই ঝালং গ্রামের সংসার। ঝালং এ রয়েছে একটি সুন্দর গুম্ফা। গুম্ফার রং বেরঙের পতাকা আর মন্ত্র প্রার্থনা সংগীত ঝালং এর সৌন্দর্যে একটি অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। এই ছোট্ট পার্বত্য গ্রামের লোকেদের আতিথেয়তা সত্যিই ভোলার নয়। ঝালংয়ের কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে জলঢাকা নদী। বনবাংলোর পাশে ঝোলুং ঝোরা এঁকে বেঁকে গিয়ে মিশেছে জলঢাকা নদীতে। সামনে জলঢাকার ওপর ব্রীজ।

ঝালং থেকে জলঢাকা পার হয়ে চলে যাওয়া যায় প্যারেন। আরেকটি ছবির মতো সুন্দর গ্রাম। প্যারেন কে পেছনে রেখে আরেকটু এগোলেই বিন্দু। ঝালং থেকে দূরত্ব ১২ কিমি। রঙিন কাঠের বাড়ির জানালায়, বারান্দায় টব আলো করে রয়েছে ফায়ারবল, পিটুনিয়া, গ্ল্যাডিয়োলা আর অর্কিডের ফুল। বিন্দুতে জলঢাকা ব্যারেজের ওপারে ভূটান। বাঁধের ওপর পায়ে হেঁটে ওঠা যায়, ছবি তোলা নিষেধ। হেঁটে আসা যায় ওপারে ভূটানের চৌহদ্দি থেকেও। হাটবারে ভূটানের গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ আসেন বিন্দুতে বাজারহাট সারতে। প্রয়োজন মুছে দেয় রাজনৈতিক সীমারেখা। এখানে বিন্দু নদী জলঢাকায় মিশেছে। নদীর গা থেকে খাড়াই উঠে গেছে ভূটান পাহাড়। আকাশ পরিষ্কার থাকলে বিন্দু থেকে হিমালয়ের বরফশৃঙ্গ দেখা যায়। ‘প্যায়ারী বিন্দু’ কিন্তু ভারত–ভূটান সীমান্তের শেষ গ্রাম। প্রতি বুধবার ঝালং–এ আর বৃহস্পতিবারে বিন্দুতে হাট বসে।

সামসিং–সুন্তালেখোলা–রকি আইল্যান্ড

লাটাগুড়ি থেকে ডুয়ার্স এর রানি মেটেলী হয়ে পাহাড়ের কোলে চা বাগান ঘেরা রাস্তা ধরে এঁকে বেঁকে চলে যাওয়া যায় সুন্দর চা বাগানে ঘেরা পাহাড়ি গ্রাম সামসিং এ। চা গাছের ওপর ছায়া দিচ্ছে বড় বড় বৃক্ষ। তার ডালে–ডালে খেলে বেড়ায় পাখির দল।

চা বাগানের শেষে দেখা যায় ভূটান পাহাড়। তার পাদদেশে ছোট ছোট গ্রাম। একদিকে চা বাগানের নিস্তব্ধতা, অন্যদিকে পাথরের মাঝ দিয়ে বয়ে চলা নদীর গর্জন। একদিকে চা বাগান আর পাহাড়ের সবুজ, অন্যদিকে নদীর পাথরের ধূসরতা। স্থির পাহাড় – চঞ্চল নদী সব মিলিয়ে সামসিং একটা ছোট্ট সুন্দর কবিতার মতো।

সামসিং থেকে কুড়ি মিনিটের পথ, পরের গন্তব্য রকি আইল্যান্ড। এখানেও সেই একই মূর্তি নদী – কিন্তু জায়গাটির রূপ আলাদা। শয়ে শয়ে ছোট বড় পাথর – সেই সব পাথরের ওপর দিয়ে, পাশ দিয়ে, ফাঁক দিয়ে বিভিন্ন ভাবে বয়ে চলেছে মূর্তি। পাথরের বাধায় জল ছিটকে যাচ্ছে চারদিকে, জলের স্রোতে সাদা ফ্যানায় পরিণত হচ্ছে ঃ আর বাধা পেয়ে নদীর জল থেকে গর্জন উঠছে অবিরত। এখানে চা বাগানের স্নিগ্ধতা নেই ঃ আছে ঘন সবুজ পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বেরিয়ে আসা নদীর দাপাদাপি। সবমিলিয়ে রকি আইল্যান্ড যেন সত্যি এক পাথরে ঘেরা আশ্চর্য দ্বীপ।

এরপর আমাদের পরের গন্তব্য সুন্তালেখোলা। সামসিং থেকে বেড়িয়ে যাওয়া সরু পিচের সড়ক ন্যাওড়া ভ্যালি জঙ্গলের বুক চিরে চলে গেছে আরও একটি ছবির মতো সুন্দর পাহাড়ি বস্তি সুন্তালেখোলায়। আসলে সুন্তালেখোলা একটি ছোট্ট ঝর্ণার নাম, তার ওপর রয়েছে এক অদ্ভুত ঝুলন্ত ব্রীজ। আর রয়েছে ছবির মতো সুন্দর কমলা বাগান। 'সুন্তলা' কথার অর্থ কমলালেবু আর 'খোলা' শব্দের অর্থ নদী।

লাটাগুড়ির হস্তশিল্প

কোথাও ঘুরতে গেলে প্রিয়জনদের জন্য উপহার কিনে নিয়ে যাওয়াটা আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার এক চিরাচরিত রেওয়াজ। লাটাগুড়িতে ঘুরতে এসেও এর ব্যাতিক্রম হয় না। কিন্তু কি কিনবেন? কোথা থেকেই বা কিনবেন? একবার ঘুরে দেখুন লাটাগুড়ির হস্তশিল্পের দোকানগুলি। দোকান তো নয় যেন সব পেয়েছির দুনিয়া। কি নেই এখানে? রয়েছে গৃহসজ্জার সামগ্রী, মহিলাদের প্রসাধনী, নিম কাঠের চিরুনী, মোষের সিং এর কারুকাজ, কাঠের খেলনা আরো কত কি? বিশেষ করে এখানকার কাঠের তৈরী হাতি–গন্ডার–হরিণ কিংবা বাইসন আপনার ড্রয়িং রুমের সৌন্দর্য ও আভিজাত্যকে পৌঁছে দেবে অন্য মাত্রায়। চাইলে এখন থেকে সংগ্রহ করতে পারে ডুয়ার্সের বিখ্যাত চা।

ইতিহাস যেখানে থমকে আছে

ভ্রামরী শক্তিপীঠ

উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক মন্দিরগুলির মধ্যে বোদাগঞ্জের ভ্রামরীদেবীর মন্দির অন্যতম। মা ভ্রামরীর কথা আমরা মার্কন্ড পুরাণের শ্রী শ্রী চন্ডীতে পাই। তিনি শত শত ভ্রমরের রূপ ধরে অরুন নামক এক অসুরকে তার অসুর সেনা সহিত ধ্বংস করেন। তাই মায়ের নাম ভ্রামরী। মূল মন্দিরে দেবী ভ্রামরীর বিগ্রহ। তিনি সিংহপৃষ্টে শায়িত মহেশ্বরের ওপর দন্ডায়মান। সেখানে দেবীর ঘট ও অষ্টভূজা দেবী সিংহরূঢ়া চন্ডীমূর্তি আছে। সাথে বিশালাকার মহাদেবের মূর্তিও আছে। তিনি পদ্মাসীন। এছাড়া দেবীর বাম চরণ আছে। কথিত আছে ১৩ রিং কুয়ো খুঁড়ে স্বপ্নাদিষ্ট এই চরণ প্রাপ্ত হয়। এই চরণ সব হিন্দুরাই স্পর্শ করতে পারেন। তাছাড়া মন্দিরে মা লক্ষী, শিবের সতী স্কন্ধে প্রলয় র্নত্য মূর্তি লিঙ্গ রূপ সদানন্দ ভৈরব আছে। বাইরে নাগ দেবীর স্থান। মাঘী পূর্ণিমার সময় গাছ তলায় কুমারী পুজো হয়। ভক্তেরা নূপুর অর্পন করেন মা ভ্রামরীকে।

মন্দির থেকে ফেরার পথে দাঁড়িয়ে যান গজলডোবা ব্যারেজে। ১৯৮৮ সালে তৈরী এই বাঁধ বর্তমানে পরিযায়ী পাখীদের পীঠস্থান। সাইবেরিয়া, অস্ট্রেলিয়া সহ ইউরোপের নানা দেশ থেকে প্রতিবছর আসে অতিথি পাখিরা। নভেম্বর মাস থেকে এদের আগমন শুরু হয়। এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ফিরতে শুরু করে ওরা। এই ফেরার পালা চলে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নর্দান ল্যাপউইং, রুডি সেলডাক, পিনটেইল, লং বিল, সি ঈগল, রেড কাস্টেওপচার্ড প্রভৃতি। পড়ন্ত বিকেলের সূর্যাস্ত, স্নিগ্ধ বাতাসের পরম স্পর্শ আর নাম না জানা বিরল পরিযায়ীদের কলরব আপনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে মুগ্ধতার আবেশে। ইচ্ছে হলে সপরিবারে তিস্তা নদীর উপর নৌকা বিহারও করতে পারেন।

জল্পেশ মন্দির

লাটাগুড়ি থেকে মাত্র ২৫ কিমি দূরে জরদা নদীর ধারে কালিকাপুরাণ, স্কন্দপুরাণ খ্যাত জল্পেশ মন্দিরের অবস্থান, যা উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত। পুরাণমতে এই তীর্থ হাজার বছরের পুরনো। প্রাগজ্যোতিষপুরের (অসম) জনৈক জল্প রাজা এই মন্দির তৈরী করান বলে দেবতা ও মন্দিরের নামও জল্পেশ। যদিও পাথুরে প্রমাণে তাঁর সাক্ষ্য মেলে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ (১৬৩২–৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) এবং তার পুত্র মোদনারায়ণ (১৬৬৫–৮০ খ্রীষ্টাব্দে) এই মন্দির তৈরী করান। আরও জানা যায় দিল্লির মুসলমান স্থাপতির হাতে মন্দির গড়ে ওঠে। গম্বুজাকৃতি চূড়াটি তারই নিদর্শন বলে মনে করা হয়। যদিও চূড়াটি লিঙ্গাকৃতি। জল্পেশ অনাদিলিঙ্গ। তাই এই চূড়াটি জল্পেশেরই প্রতিরূপ বলে অনেকে মনে করেন। ১২৮ ফুট দীর্ঘ ও ১২০ ফুট প্রশস্ত এই মন্দিরের উচ্চতা ১২৭ ফুট।

জটিলেশ্বর মন্দির

ময়নাগুড়ি থেকে ২০ কিমি দূরে অবস্থিত জটিলেশ্বর মন্দির উত্তরবঙ্গের অন্যমত প্রাচীন মন্দির। প্রাচীনত্বের দিক থেকে এই মন্দির জল্পেশ মন্দিরকেও পেছনে ফেলে দেয়। মন্দিরটি নবম শতকের বলে মনে করেন প্রত্নতত্ত্ববিদেরা। সম্ভবত পাল রাজাদের আমলেই (খ্রীঃপূঃ ৩২০–৬০০) এই মন্দির গড়ে ওঠে। জল্পেশের মতো এই মন্দিরটিও একটি শৈবতীর্থ। জাগ্রত এই শিব মন্দিরে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পূণ্যার্থীরা আসেন পুজো দিতে। তাই লাটাগুড়িতে ঘুরতে এসে জল্পেশ ও জটিলেশ্বর মন্দির না দেখলে আপনার ডুয়ার্স ভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

শিবম বালাজী মন্দির

লাটাগুড়িতে ঘুরতে আসা বহু পর্যটকেরই ফেরার টিকিট কাটা থাকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে। নিউ মাল জংশনে ট্রেন ধরতে যাওয়ার পথে দর্শন করে যান শিবম বালাজী মন্দির। অত্যন্ত সুন্দর কারুকার্যে ভরা এই মন্দিরে প্রবেশ করলে মনে হবে যেন হঠাৎ করে দক্ষিণ ভারতে চলে এসেছেন। প্রবেশদ্বার থেকে ভেতরের দেওয়াল, সর্বত্রই দৃষ্টিনন্দন কারুকার্যশৈলীর সমাহার। শ্রী হনুমানজীর মূর্তির পাশাপাশি এই মন্দিরে রয়েছে কন্যাকুমারী থেকে আনা রামসেতুর রামশিলা। ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির বর্তমানে শিবম বালাজী ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত।

বামনিঝোরা মহাকাল স্থান

গরুমারা জাতীয় উদ্যানের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করবার মাঝে যদি কিছুটা সময় পান তবে ঘুরে আসতে পারেন স্থানীয় মহাকাল মন্দির থেকে। লাটাগুড়ির ওপর দিয়ে বিস্তৃত ৩১নং জাতীয় সড়ক ধরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রায় আট কিমি ছুটে চললেই আপনি পৌঁছে যাবেন এই প্রাকৃতিক বন্য মন্দিরে। না, ইট সিমেন্টের চৌহদ্দি নেই, আছে সবুজে ঘেরা বন্য গাছপালা, নেই মাটির তৈরী প্রতিমা, বদলে আছে চাঁপা গাছে আঁকা হাতির চোখ ও কিছু পাথরের সমাহার, পাশ ঘেঁষে ছুটে চলেছে শীর্ণ বন্য নদী। জঙ্গলে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে হাতির উপদ্রব একটি নিত্যদিনের ঘটনা। হাতির হামলায় কম বেশি আক্রান্তও হন এলাকার মানুষজন, ক্ষতি হয় ঘড়বাড়ি ও শস্যক্ষেত। তাই এলাকাবাসীরা মহাকালরূপে হাতিকে দেখেন এবং তাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে এই মহাকাল মন্দিরে পূজো দিয়ে থাকেন। আজ থেকে প্রায় কয়েক দশক আগে এখানে একটি চাঁপা গাছে হাতির চোখের প্রতিরূপ দর্শন থেকেই এই মহাকালধামের উৎপত্তি। অনেকের কাছে স্থানটি বামনিঝোরা বা বামনিথান নামেও পরিচিত। বন্য পরিবেশের মাঝে আধ্যাত্মিকতার এই হাতছানি আপনাকে নিয়ে যেতে পারে এক অন্য পৃথিবীতে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রাঙ্গনে

টিক্কার ইউনিফর্মে শিশুর মগজ,
যুবকের পাঁজরের গুঁড়ো,
নিয়াজির টুপিতে রক্তের প্রস্রবণ,
ফরমান আলীর টাইয়ের নটে ঝুলন্ত তরুণী...
তুমি কি তাদের কখনও করবে ক্ষমা?

– রক্তসেচ কবিতার অংশ

ঠিক ধরেছেন, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের কথাই বলছি। সেই রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের আঁচ অনুভব করুন লাটাগুড়ি থেকে। লাটাগুড়ি থেকে ঘন্টাখানেকের যাত্রাপথ অতিক্রম করে পৌঁছে যান মেটেলী গ্রামের এয়ারফিল্ড গ্রাউন্ডে।

৭১ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকারের সহযোগিতায় এখানে গড়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্প। শিলিগুড়ি ও হাসিমারা ক্যাম্প থেকে ভারতীয় সেনা অফিসারেরা এসে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দিতেন। পাকিস্তানি সেনাদের নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহু মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই উদ্বাস্তুদের মধ্যেকার যুবক সম্প্রদায়কে নিয়ে গড়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী। তৎকালীন সময়ের মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন নবকৃষ্ণ রায়। তার সুযোগ্য ভাইপো শিক্ষক শ্রী অজয় রায় মহাশয়ের কাছ থেকে সেই আগুনঝরা দিনের ইতিহাস শুনতে শুনতে সত্যিই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে। সাদা জামা সাদা প্যান্ট পরিহিত মুক্তিযোদ্ধাদের স্টেনগান এস.এল.এস ৩নট, এল.এম.জি. প্রভৃতি অস্ত্রচালনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। তারপর রাতের অন্ধকারে ভারতীয় সেনার সহযোগিতায় নয় জনের এক একটি ট্রুপ ঝাঁপিয়ে পড়ত পাকিস্তানী সেনাদের উপর।

সবুজ ঘাসে ঢাকা সুবিশাল এয়ারফিল্ড গ্রাউন্ডের বাতাসে আজও কান পাতলে শুনতে পাবেন প্যারেডের আওয়াজ। উপলব্ধি করতে পারবেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে কিছু উদ্যম প্রাণের মরণপন সংগ্রামস্পৃহাকে। শোনা যায়, ট্রেনিংয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে এখানে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার নামতো। অস্থায়ী হেলিপ্যাডের সিগন্যাল টাওয়ারটি আজও দাঁড়িয়ে মাঠের কোনায়। একাকী, নিঃসঙ্গ। যেন বলছে, ইতিহাস আজও মোছে নাই, ইতিহাস এখানে থমকে আছে।

বাঘপুল ও শেবকেশ্বরী কালীমন্দির

লাটাগুড়ি থেকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে যাওয়ার পথে অবশ্যদর্শনীয় স্থান হলো সেভকের কালীবাড়ি ও করোনেশন ব্রীজ। সেভক শব্দটি ভূটানী শব্দ,যার অর্থ হল দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল। দুই পাহাড়ের মাঝে সংযোগ স্থাপন করেছে বলে এই ব্রীজটির এইরূপ নাম।

জাতীয় সড়কের ধারে পাহাড়ের কোলে গড়ে ওঠা সেভকেশ্বরী কালী মন্দির দেবীর আরাধনার পত্তনের সময়কাল সম্বন্ধে সঠিক ভাবে কেউ বলতে পারেনা। প্রথম দিকে এখানে পঞ্চমুন্ডির আসন ছিল। এরপর ১৯৫২ সালে দেবীর মন্দিরের আনুষ্ঠানিক ভাবে সূচনা হয়।

মন্দিরে মোট ১০৭টি সিঁড়ি রয়েছে সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে পুজো দিতে হয়।

মন্দির খোলার সময় সকাল ৮টা আর বন্ধের সময় সন্ধ্যা ৬টা লোকে বলে এই কালী মন্দিরের দেবী খুব জাগ্রত।
সেভক কালী মন্দিরের পাশে কিছুটা দূরে রয়েছে সেভকের খ্যাত করোনেশন ব্রীজ। তিনদিক সবুজ পাহাড়ে ঘেরা, নীচ দিয়ে গভীর খাত কেটে নিজের তেজস্বী রূপে প্রবাহমান তিস্তা নদী। তারই মাঝে বছরের পর বছর এক বিস্ময়কর সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই ব্রীজটি ব্রীজের দুইধারে ব্যাঘ্রমূর্তি থাকায় ব্রীজের অপর নাম বাঘপুল অথবা টাইগার ব্রীজ।
ব্রিটিশ রাজত্বকালে কিং জর্জ ষষ্ঠ ও রাণী এলিজাবেথের রাজ্য অভিষেককে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য ১৯৩৭ সালে এই ব্রীজটি স্থাপিত হয়। ব্রীজটি জলপাইগুড়ি জেলার সঙ্গে দর্জিলিং জেলার সংযোগ ঘটিয়েছে। পথচলতি পর্যটকেরা প্রায়ই এই ব্রীজে দাঁড়িয়ে পাহাড়ী সৌন্দর্য্য, মাতাল হাওয়া ও তিস্তার গর্জনকে উপভোগ করে থাকেন। ব্রীজের চারপাশে প্রচুর বাঁদর দেখতে পাওয়া যায়।

ডালিম ফোর্ট

লাটাগুড়ি যেন সব পেয়েছির আসর, কি নেই এখানে, পাহাড়, জঙ্গল, চা–বাগান, দেব দেবীর মন্দির, নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ ঢিলছোঁড়া দূরত্বে। আর দুর্গ... তাও হাজির, এখান থেকে দেড় ঘন্টার পথ ডালিম ফোর্ট। একদা এই ফোর্ট ব্রিটিশদের ভয়ের কারণ ছিল। এই দূর্গের এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। লেখক ডেভিড ফিল্ড রেণির বিখ্যাত বই 'Bhutan and the story of the Doar War' এ ডালিম দূর্গ দখলের রোমাঞ্চকর বিবরণ রয়েছে, শক্ত পোক্ত এই দুর্গের ভেতর থেকে ভূটানীরা ইংরেজদেরকে চোরা গোপ্তা আক্রমাণ হামেশাই করতো, দূর্গের পতন ঘটাতে ব্রিটিশ ও ভারতীয় সেনাদের মরণপণ লড়াই চালাতে হয়েছিল। গভীর অরণ্য বেষ্টিত চড়াই হিংস্র শ্বাপদ সংকুল বেষ্টিত ও জোকের ভয়ংকর উৎপাত দুশো বছর ধরে এসবের স্মৃতি বহন করে চলেছে যা একবার দেখতেই হয়।
ইংরেজ সৈন্যের ক্যাপ্টেন, ল্যান্স ভি. কামসিয়ার, লেফটেন্যান্ট আর্মষ্ট্রং এবং রেনি সাহেব বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে দূর্গের উপর প্রবল গোলা বর্ষন শুরু করেন। অন্যদিকে ভূটিয়াদের অস্ত্র বলতে তীর ধনুক ও পাথর ছুঁড়ে মারা, তাই ওরা আর পালাবার পথ খুঁজে পায়নি, আত্মসমর্পণই ছিল একমাত্র উপায়। সিঞ্চলা সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে ডুয়ার্সের পাহাড়ে শান্তি ফিরে আসে, ডালিম ফোর্ট যুক্ত হয় পশ্চিম ডুয়ার্সের সঙ্গে।
ডালিম শব্দটি নাকি তিব্বতি শব্দ যার অর্থ তিরের ফলা, ভূতত্ত্ববিদরা বলেন ডালিম আসলে এক প্রকার শিলা। অন্যমতে এখানে প্রচুর ডালিম গাছ ছিল, তর্ক যাই থাক এটাই সত্য যে লাটাগুড়ির অনেক কাছেই দুর্গম এক পাহাড়ের মাথায় ডালিম ফোর্ট যা দূর্গ প্রেমীদের এক অসাধারণ দ্রষ্টব্যের জায়গা, যার অমূল্য ঐতিহাসিক চিহ্ন নিয়ে আজও বর্তমান।

ভিন্ন স্বাদের রান্নাঘরে, মন ছুঁটে যায় বারে বারে

নতুন চায়ের গন্ধে মাতুন, প্রক্রিয়াকরণের সাক্ষী থাকুন

বাঙালির চা প্রীতি সবার জানা, ঘুম থেকে উঠে গরম গরম এক কাপ চা এ চুমুক না দিলে যেন দিনটা ঠিক ভাবে শুরুই হয়না। ব্রিটিশদের ছেড়ে যাওয়া চা খাওয়ার অভ্যাস আজ প্রতিটি বাঙালির বাড়ির আলিন্দে সকাল সকাল পৌঁছে গেছে। যেটা পান করে দিন শুরু হয় তার সম্বন্ধে জানবোনা তা কখনো হয় নাকি? আর জানতে হলে অবশ্যই আসতে হবে লাটাগুড়ি। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওয়নার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের অফিস থেকে প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করে রাস্তার দুধারে সবুজ গালিচা বিছানো চা বাগানের মধ্যে দিয়ে লাটাগুড়ি থেকে গাড়িতে মাত্র কুড়ি মিনিটের পথ অতিক্রম করে সোজা ছাওয়াফুলি টি এস্টেট এর ফ্যাক্টরিতে। ফ্যাক্টরির ম্যানেজার ও তাঁর সহকর্মীরা আপনাদের স্বাগত জানাবে তাদেরই বাগানের তৈরী গরম এক কাপ চা দিয়ে। আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী এই ফ্যাক্টরি ব্যবসায়িক চিন্তা ভাবনার পাশাপাশি পর্যটকদের কথা মাথায় রেখেই তৈরী করা হয়েছে। তাই ফ্যাক্টরির ভেতর প্রবেশ করে নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে বাগান থেকে কাঁচা চা পাতা এনে চা তৈরীর সমগ্র বিষয় সম্পর্কে জানবার জন্য আপনার যে কৌতুহল ছিল তা পূরণ হবেই। আর ইচ্ছে করলেই সিটিসি অর্থাৎ কাটিং থ্রাসিং ক্রাসিং পদ্ধতিতে তৈরী চা আপনার প্রিয়জনকে উপহার দেবার জন্য স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে নিয়ে যেতেই পারেন, যা আপনার জীবনের সুখ স্মৃতির তালিকায় আর একটি নাম লিপিবদ্ধ হবে ছাওয়াফুলি চা।

তিস্তা নদীর রূপোলী, মাছের সেরা বোরোলি

বোরোলী মাছ বা বৈরালী মাছকে মোটামুটিভাবে উত্তরবঙ্গের ব্র্যান্ড এম্বাসেডার বলা যেতে পারে। উত্তরবঙ্গের বেশীরভাড় পাহাড়ী নদীগুলোতেই, মূলতঃ তিস্তা, জলঢাকা, কালজানি, মানসাই এবং এদের শাখা প্রশাখাগুলোতে স্বর্গীয় স্বাদের এই রূপোলি মাছ পাওয়া যায়। ইষৎ মিষ্ট স্বাদের এই মাছ মুখে দিলে গলে যায়। অতীতে বহু বিখ্যাত ব্যক্তিকে নিজ স্বাদগুণে উত্তরবঙ্গে টেনে এনেছে। লাটাগুড়ির বিভিন্ন রিসর্টে এই সুস্বাদু মাছ পরিবেশিত হয়। ডুয়ার্সে ঘুরতে এসে এই স্বর্গীয় বস্তুটি আস্বাদন না করলে আপনার ডুয়ার্স ভ্রমণ যে অপূর্ণ থেকে যাবে তা বলাইবাহুল্য।

হারিয়ে যান হাঁড়িয়ায়

বাঙালী বরাবরই ভোজন রসিক। বেড়াতে বেড়িয়ে নতুন দর্শনীয় স্থান দেখার পাশাপাশি সেই স্থানের নতুন স্বাদের খাবার চেখে দেখবেন এটা স্বাভাবিক। আর তা যদি হয় স্থানীয় আদিবাসীদের ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরী হাঁড়িয়া সেটা শুধু চেখেই দেখবেননা তার পুরো স্বাদও গ্রহণ করবেন এটা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। আসলে আদিবাসী মহিলারা সিলভারের চকচকে হাড়িতে তৈরী করে বা বিক্রি করে বলে এর স্থানীয় নাম হাঁড়িয়া। এই নেশা জাতীয় পানীয় পুরোপুরি ভেষজ সামগ্রী দিয়ে তৈরী করে এই এলাকার আদিবাসী মহিলারা তাদের নিজের ঘরে বসেই। লাটাগুড়ির জঙ্গল থেকে চিতুই গাছের শেকড় ও ভুঁই কুমড়া গাছের আলু সংগ্রহ করে সেগুলো বাড়িতে ভালো করে গুঁড়ো করে বড়ির আকারে বানিয়ে সেটা ভালো করে রোদে শুকিয়ে রেখে দেয়। এরপর আতপ চাল সেদ্ধ করে তাতে সেই বড়ি গুলো মিশিয়ে হাড়ির মুখ বন্ধ করে ঠান্ডা জায়গায় রেখে দেয়। এভাবে গরমকালে ৪–৫ দিন আর শীতকালে ৮–৯ দিন রেখে দেবার পর বন্ধ হাঁড়ির মুখ খোলা হয়। হাঁড়িতে তৈরী হওয়া দুধ সাদা জল খুব সাবধানে হাঁড়ি কাত করে অন্য পাত্রে বার করে নেওয়া হয়। ব্যাস পান করার জন্য তৈরী হাঁড়িয়া। প্রতিদিন বিকেলে লাটাগুড়ির আলসিয়া মোড়ে বা শনি ও রবিবার নেওড়া চা বাগানের হাটে সারিবদ্ধ হাঁড়ি নিয়ে মহিলাদের হাঁড়িয়া বিক্রি করতে দেখা যায়। তবে সাবধান অতিরিক্ত সেবনে আপনার রাত্রি যাপনের নির্দিষ্ট ঠিকানায় ফিরতে দিকভ্রষ্ট হতেই পারেন।

লাটাগুড়ির পেল্লাই চমচম

ঘোরাঘুরি তো অনেক হলো, আসুন এবার একটু মিষ্টি মুখ করা যাক। এই দেখুন! মিষ্টির কথা বলছি অথচ পেল্লাই চমচমের নামটা নেওয়া হলো না। লাটাগুড়িতে ঘুরতে এলেন আর পেল্লাই চমচম খেলেন না এটা হতে পারে না। নামের সাথেই জড়িয়ে রয়েছে এর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ। কাজু কিশমিশ আর ক্ষীর দিয়ে তৈরী চমচমগুলির কোনোটির ওজন ৫০০গ্রাম, কোনোটির বা ১কেজি। দাম শুরু ১৩০ টাকা থেকে। স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় এই মিষ্টি পর্যটকদের কাছে ভীষন জনপ্রিয়। তাই বাড়ী ফেরার আগে কোনো এক সন্ধ্যায় পরিবারের সকলকে নিয়ে চেখে দেখুন প্রবাদে পরিণত হওয়া এই মিষ্টির স্বাদ। পেল্লাই চমচমের স্বাদের মোড়কে যত্নে থাকুক আপনার লাটাগুড়ি ভ্রমণের মিষ্টি সুখস্মৃতি।